কালের কণ্ঠ

তারিখ ...27 JUL 2015...
পৃষ্ঠা ...১... কলাম ...2...

টাকা খেয়ে দেদার স্কুল কলেজের অনুমোদন

শরীফুল আলম সুমন ▷

নীতিমালার তোয়াক্কা না করে ঘুষের বিনিময়ে নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজের অনুমোদন দিয়ে চলেছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের একটি সিন্ডিকেট। যেখানে তাদের এখতিয়ার নেই, সেখানে ভুয়া কাগজপত্র তৈরি করে তারা এ কাজ করছে। অনুসন্ধানে জানা গেছে, একটি নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদন দিতে এই সিন্ডিকেটকে দিতে হয় দেড় থেকে দুই লাখ টাকা; মাধ্যমিক বিদ্যালয় অনুমোদনে পাঁচ থেকে ছয় লাখ আর কলেজ অনুমোদনে দিতে হয় কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা। এই টাকা দিলে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের কোনো শর্ত পূরণেরই প্রয়োজন হয় না।

জানা যায়, বোর্ডের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা থেকে শুরু করে কর্মচারী ইউনিয়নের নেতারা পর্যন্ত এ চক্রের সঙ্গে জড়িত। এর সঙ্গে সরাসরি জড়িত স্কুল-কলেজ পরিদর্শকের কার্যালয়ের একাধিক কর্মকর্তা ও শ্রমিক ইউনিয়নের নেতারা।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের নীতিমালা অনুযায়ী, শর্ত শিথিল করে পাঠদানের অনুমতি দিতে চাইলে স্থানীয় সংসদ সদস্যের ডিও লেটারের মাধ্যমে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আবেদন করতে হবে। এরপর শিক্ষা বোর্ড সেই প্রতিষ্ঠান (স্কুল-কলেজ) পরিদর্শন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে একটি প্রতিবেদন দেবে। তাদের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অনুমতি দেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের দুর্নীতি

- ১৩ শর্ত মানা হয় না
- মানের দিকে নজর নেই, টাকা কামাতে ব্যস্ত বোর্ডের দুই দপ্তর
- ছয় বছরে অবৈধ অনুমোদন ২০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের
- তদন্তে নেমেছে দুদক

জানা যায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের জন্য ১৩টি শর্ত পূরণ করতে হয়। তবে দুর্গম এলাকা বা আশপাশে কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান না থাকলে শর্ত শিথিল করেও অনেক সময় অনুমোদন দেয় মন্ত্রণালয়। অথচ মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়াই শিক্ষা বোর্ডের কর্মকর্তারা টাকার বিনিময়ে যত্রতত্র একাধিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দিয়ে যাচ্ছেন।

২০১০ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার দানাপাটুলী ইউনিয়নের কালিয়াকান্দা গ্রামে এলাকাবাসীর অনুরোধে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্থাপন করেন 'ছাইদুর রহমান আদর্শ নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়'। স্কুল স্থাপন ও পরিচালনা কমিটি করেই বিদেশ চলে যান তিনি। এরপর বেশির ভাগ সময় দেশের বাইরে কাটানোয় তিনি আর কোনো খোঁজখবর রাখেননি। গত চার বছরে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা প্রায় ১৫০-এ উন্নীত হয়। কিন্তু অনুমোদন না থাকায় চার বছরই জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি) পাশের গ্রামের হাজি শামসুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে দেয় এই স্কুলের শিক্ষার্থীরা। স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা চলতি বছরের মার্চে দেশে এসে গ্রামে গিয়ে স্কুলের খোঁজখবর নেন। দেখেন, পরিচালনা কমিটি এখনো স্কুলের অনুমোদন নেয়নি। পরিচালনা কমিটি ও প্রধান শিক্ষকের কাছে স্কুলের আয়-ব্যয় এবং নিজের পাঠানো টাকার হিসাব-নিকাশ চাইলে কোনো হিসাবই দিতে পারেননি তাঁরা। ফলে কমিটি ভেঙে দিয়ে প্রধান শিক্ষককে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এরপর গত ১৫ মার্চ স্কুলের অনুমোদনের জন্য ঢাকা বোর্ডে আবেদন করেন তিনি। কিন্তু ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক ও পরিচালনা কমিটির সভাপতি এক মাসের মধ্যেই ছাইদুর রহমান স্কুলের ১০০ গজ দূরে তাহেরুল উলুম কওমি মাদ্রাসায় 'তাহের উদ্দিন আনোয়ারী নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়' নামে আরেকটি স্কুলের সাইনবোর্ড টাঙিয়ে গত ১৫ এপ্রিল ঢাকা বোর্ডে এই স্কুলের জন্য অনুমোদন চান। আ

▶▶ পৃষ্ঠা ৬ ঃ ৬

টাকা খেয়ে দেদার স্কুল-কলেজের অনুমোদন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

পুরনো একটি প্রতিষ্ঠিত স্কুলকে অনুমোদন না দিয়ে ঢাকা বোর্ড গত ১০ মে তাহের উদ্দিন বিদ্যালয়কেই অনুমোদন দেয়। অথচ এই স্কুল অনুমোদনের শর্তগুলোর বেশির ভাগই পূরণ করেনি।

স্কুল অনুমোদনের ১৩টি শর্তের অন্যতম হলো অখণ্ড জমি থাকতে হবে। কিন্তু অনুসন্ধানে জানা যায়, তাহের উদ্দিন বিদ্যালয়ের কোনো অখণ্ড জমি নেই। স্কুলের নামে দানাপাটুলী মৌজার বিভিন্ন দাগের ৫৯ শতাংশ জমি রেজিস্ট্রেশন করা হয় স্কুল অনুমোদন পাওয়ার পর। অথচ শর্ত লঙ্ঘনের বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে গত ২৮ মে ছাইদুর রহমান বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটির বর্তমান সভাপতি ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও স্কুল পরিদর্শক বরাবর আবেদন করলেও তা গ্রাহ্যই করেনি কেউ।

জানা যায়, গত ২৫ এপ্রিল দুটি স্কুলই পরিদর্শনে যান বোর্ডের উপবিদ্যালয় পরিদর্শক-২ মো. নূরুল আমীন। তখন ছাইদুর রহমান বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরে। দুই স্কুলের দ্বন্দ্বের বিষয়টিও তাঁকে জানানো হয়। সে সময় তিনি তাহের উদ্দিন বিদ্যালয় এখনো শর্ত পূরণ করেনি বলেও স্বীকার করেন। ঢাকায় ফিরেও ছাইদুর রহমান বিদ্যালয়টিই অনুমোদন পাওয়ার যোগ্য বলে মত দেন তিনি। কিন্তু এর ১৫ দিন পরই অনুমোদন পায় তাহের উদ্দিন বিদ্যালয়।

অনুসন্ধানে বেরিয়ে আসে আরো গুরুতর তথ্য। ছাইদুর রহমান স্কুল কর্তৃপক্ষ এক লাখ ৩০ হাজার টাকার বিনিময়ে আরেকজনের মাধ্যমে নূরুল আমীনের সঙ্গে চুক্তি করেন। সেই অনুযায়ী নূরুল আমীনকে ৭০ হাজার টাকা পরিশোধও করা হয়। কিন্তু তাহের উদ্দিন বিদ্যালয় আরো বেশি টাকার চুক্তি করলে তাদেরই অনুমোদন দেওয়া হয়।

ছাইদুর রহমান স্কুলের বর্তমান সভাপতি মো. মাহবুবুর রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমরা স্কুল অনুমোদনের জন্য আরেকজনের মাধ্যমে নূরুল আমীনকে ৭০ হাজার টাকা দিয়েছিলাম। বাকি টাকাও দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু টাকা নেওয়ার পরও তিনি স্কুলের অনুমোদন দেননি। তবে এখন পর্যন্ত তিনি তিন কিস্তিতে বিকাশের মাধ্যমে ৩০ হাজার টাকা ফেরত দিয়েছেন। আমরা ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান ও বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে আবেদন করেছিলাম অন্তত বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হোক। কিন্তু আমাদের কোনো কথাই শুনছে না বোর্ড।'

এ ব্যাপারে জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের উপবিদ্যালয় পরিদর্শক-২ মো. নূরুল আমীন কালের কণ্ঠকে বলেন, 'আমি দুটি স্কুলই পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। যারা শর্তে এগিয়ে আছে তাদেরই অনুমোদন দেওয়া হয়েছে; যদিও তাহের উদ্দিন আনোয়ারী স্কুল আমাদের কাছে অখণ্ড জমির কাগজ জমা দিয়েছে। কিন্তু পরিদর্শনে গিয়ে হঠাৎ করে এসব যাচাই করাও সম্ভব নয়। তবে শর্তের কোনো লঙ্ঘন হলে আমরা তদন্ত করব। প্রমাণিত হলে স্কুলের অনুমোদন বাতিল করা হবে।' টাকা নেওয়ার অভিযোগের বিষয়টি তিনি অস্বীকার করে বলেন, 'এটা মিথ্যা কথা। ছাইদুর রহমান স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমি কোনো টাকা নিইনি।'

জানা গেছে, এভাবে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত গত ছয় বছরে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড দুই শতাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে অবৈধ অনুমোদন দিয়েছে। এর মধ্যে রাজধানীর অলিগলিতে ফ্ল্যাট বাড়িতেই শতাধিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে। জালিয়াতি করেই এসব প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময়ের মধ্যে লাইসিয়াম কলেজ, অস্ট্রেলিয়ান কলেজ, লাইট হাউস কলেজ, উত্তরা ক্রিডেন্স কলেজ, নিউ ক্যাসল কলেজ, ইউরোপিয়ান কলেজ, গ্লাজগো কমার্স কলেজ, মাইলেসিয়াম কলেজসহ বেশ কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে টাকার বিনিময়ে অনুমোদন দেওয়ার তথ্য জানা গেছে। অবৈধ অনুমোদন নিয়ে অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই আবার এমপিওভুক্তও হয়েছে, যা দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) পর্যন্ত গড়িয়েছে।

সূত্র জানায়, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে পর্যাপ্ত স্কুল-কলেজ থাকার পরও টাকার বিনিময়ে প্রতিনিয়তই নতুন অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে। এই বোর্ডের স্কুল ও কলেজ পরিদর্শকের দপ্তর যেন 'মধুর খনি'। এই দুই দপ্তরে বদলি হয়ে আসতে সবাই নানা তদবির করে থাকেন; লাখ লাখ টাকা খরচ করতেও দ্বিধা বোধ করেন না। কারণ এখানে একবার এলে সহজেই কোটিপতি হওয়া যায়। অথচ এই দুই দপ্তর শিক্ষার মান বাড়াতে চারটি বিষয়ে সরাসরি নজর দেওয়ার মূল দায়িত্ব বাদ দিয়ে তারা টাকা কামাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। গত ছয় বছর বোর্ডের এই দুই দপ্তর শিক্ষামন্ত্রীর সাবেক এপিএস মঈন রঞ্জন বাড়ৈ সিন্ডিকেটের দখলে। তাঁকে খুশি করেই এখানে আসতে হয় কর্মকর্তাদের। গত সপ্তাহে শিক্ষামন্ত্রীর এই এপিএসকে নানা বিতর্ক ও দুর্নীতির অভিযোগে অব্যাহতি দেওয়া হলেও তিনি তাঁর পছন্দের জায়গা হিসেবে ইতিমধ্যেই ঢাকা বোর্ডের উপকলেজ পরিদর্শক হিসেবে যোগদান করেছেন।

অভিযোগ রয়েছে, ঢাকা বোর্ডের বর্তমান সচিব শাহেদুল খবির ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক শ্রীকান্ত কুমার চন্দ যখন স্কুল ও কলেজ পরিদর্শক ছিলেন তখনই শর্ত শিথিল করে সবচেয়ে বেশি অনুমোদনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু তাঁরা শিক্ষামন্ত্রীর সাবেক এপিএসের সিন্ডিকেটের লোক বলে তাঁদের অনিয়মের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়ার সাহস পাননি বোর্ড চেয়ারম্যানও।

এসব বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'দুর্নীতি আছে তা আমরা অস্বীকার করি না। অনেক অনিয়মই হয়, তবে তা আমরা কমিয়ে আনার চেষ্টা করছি। আর ঢাকা বোর্ডও যদি কোনো অনিয়ম করে থাকে, প্রমাণ পেলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'

স্কুল-কলেজ অনুমোদনে ঢাকা বোর্ডের জালিয়াতির তদন্তে অনুসন্ধান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দুদক। তদন্তকারী কর্মকর্তা হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয় দুদকের উপপরিচালক আবদুহু ছাত্তার সরকারকে। তিনি গত ৫ এপ্রিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতি ছাড়া ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন দেওয়া স্কুল-কলেজের তথ্য দুদককে সরবরাহ করতে চিঠি দেন। সেখানে বলা হয়, 'শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ব্যতীত পাঠদানের অনুমতি এবং পরবর্তীতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা (মাউশি) অধিদপ্তর কর্তৃক এমপিও প্রদানের অভিযোগের সুষ্ঠু অনুসন্ধানের স্বার্থে সকল কাগজপত্র পর্যালোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। তাই ১২ এপ্রিলের মধ্যে এসব তথ্য দুদকে পাঠাতে বলা হলো।' এতে ২০০৯ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অজান্তে অনুমোদন দেওয়া সব প্রতিষ্ঠানের তথ্য চাওয়া হয়।

তবে এ ক্ষেত্রে ঢাকা বোর্ড ভিন্ন কৌশলের আশ্রয় নেয়। কারণ দুদকের চাওয়া তথ্যের সময়কালে বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন শাহেদুল খবির চৌধুরী, যিনি বর্তমানে ঢাকা বোর্ডের সচিব। তিনিই দুদকের চিঠির জবাব দিলেও নিজের নামটি উল্লেখ করেননি। জবাবে বলা হয়, 'বোর্ডের আওতাধীন নিম্ন মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং কলেজসমূহের পাঠদানের অনুমতি ও স্বীকৃতিসংক্রান্ত যাবতীয় কাজ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সম্পাদন করে থাকে। এ বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমতির প্রয়োজন হয় না। তবে কোনো প্রতিষ্ঠান মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হতে চাইলে তাদের স্বীকৃতি প্রদানে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনের প্রয়োজন হয়।'

জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিথিলযোগ্য শর্ত বোর্ডও শিথিল করে অনুমোদন দিতে পারে। তবে যে শর্ত শিথিলযোগ্য নয়, তার জন্য ঠিকই মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। এই শর্ত শিথিলের ব্যাপারটা দুদকের কাছে পরিষ্কার ছিল না। আমরা তাদের চিঠির জবাব দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিয়েছি।'

কিন্তু শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ২০০৩ সালের ২১ এপ্রিল জারি করা এ-সংক্রান্ত সর্বশেষ আদেশে বলা হয়েছে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন, পাঠদানের অনুমতি ও একাডেমিক স্বীকৃতিসংক্রান্ত যাবতীয় নিষ্পত্তিমূলক কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট শিক্ষা বোর্ডের মাধ্যমে সম্পাদিত হবে। কিন্তু বিধি অনুযায়ী শর্ত শিথিলের এখতিয়ার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

জানা যায়, দুদকের চাওয়া কাগজপত্রের সময়কালের বেশির ভাগজুড়েই বোর্ডের বিদ্যালয় পরিদর্শক ছিলেন শাহেদুল খবির, কলেজ পরিদর্শক ছিলেন ড. শ্রীকান্ত কুমার চন্দ, যাঁরা এখন যথাক্রমে ঢাকা বোর্ডের সচিব ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক।

জানতে চাইলে ঢাকা বোর্ডের সচিব শাহেদুল খবির চৌধুরী কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অনুমোদনের ক্ষেত্রে বোর্ডই সর্বময় ক্ষমতার মালিক। শর্ত শিথিল করে অনুমোদন দেওয়া প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা খুবই কম। আর এটা রেগুলার প্র্যাকটিসও না। অনুমোদন নিয়ে দুদকের চিঠির জবাব আমরা নীতিমালার আলোকেই দিয়েছি। আর অনুমোদন নিয়ে আমাদের কাছে সুস্পষ্ট কোনো অভিযোগ এলে আমরা অবশ্যই ব্যবস্থা নেব।'